# স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে পারাই সবচেয়ে জরুরি

জি আর ই-তে ভাল স্কোর করতে পারলেই বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি করার সুযোগ পাওয়া যাবে, তা কিন্তু নয়। এই স্কোর তোমায় নির্বাচনের প্রথম ধাপটা পার করে দিতে পারে। পরের ধাপগুলোতে দেখা হবে তোমার স্টেটমেন্ট অব পারপাস, রেজিউমে, শিক্ষকদের দেওয়া লেটার অব রেকমেন্ডেশন ইত্যাদি। এগুলো ঠিক কেমনটা হলে ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। প্রস্তুতি-কে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এর শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ **মৈত্রীশ ঘটক**। স্বভাবতই, অর্থনীতি নিয়ে পিএইচ ডি করার জন্য কী ভাবে আবেদন করতে হবে, অধ্যাপক ঘটক প্রধানত সেই প্রসঙ্গেই আলোচনা করেছেন।

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি করার জন্য আবেদন করার সময় কোনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন— জি আর ই-র স্কোর, বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষার রেজাল্ট, স্টেটমেন্ট অব পারপাস নাকি রেকমেন্ডেশন?

মৈত্রীশ ঘটক: এই প্রশ্নটা আমায় অনেকেই করেন। এক কথায় উত্তর দেওয়া মুশকিল, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় যখন পিএইচ ডি স্তরের জন্য ছাত্র বাছাই করে, তখন সেই প্রক্রিয়াটির অনেকগুলো ধাপ থাকে। জি আর ই-র স্কোর, বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষার রেজাল্ট, স্টেটমেন্ট অব পারপাস, রেকমেন্ডেশন— সবক'টাই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ। যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে জি আর ই-র স্কোর চাওয়া হয়, সেখানে বাছাই প্রক্রিয়ার একেবারে প্রাথমিক স্তরে এই স্কোরটির গুরুত্ব। এই পরীক্ষায় যারা কম স্কোর করে, তারা গোড়াতেই বাদ পড়ে যায়। এর পরের স্তরে বিভিন্ন পরীক্ষার রেজাল্ট দেখা হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রেই যেমন দেখা হয়, ছাত্রটির অর্থনীতি, অঙ্ক এবং স্ট্যাটিস্টিকস-এর ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন এবং সে এই বিষয়গুলিতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে কেমন নম্বর পেয়েছে। কারণ সহজ। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার প্রথম দুই বছরের কোর্সওয়ার্কে বেশ কঠিন অঙ্ক এবং স্ট্যাটিস্টিকস সামলাতে হয়। যে ছাত্র সেই চাপ নিতে পারবে না, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই স্তরেই তাকে বাদ দিয়ে দিতে চায়। এই দুটো ধাপ পেরোনোর পর চূড়ান্ত পর্যায়ের বাছাই হয়। এই স্তরে স্টেটমেন্ট অব পারপাস বা রেকমেন্ডেশনের গুরুত্ব। খেয়াল রাখা ভাল, প্রথম দুটি স্তরে মূলত ছাঁটাই করা হয়। আর, এই শেষ স্তরটিতে যোগ্য ছাত্রদের মধ্যে যোগ্যতরদের বাছাই করা হয়।

ছাত্র নির্বাচনের এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যে ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে ভাল গবেষক হয়ে উঠতে পারে, আমরা তাদেরই সুযোগ দিতে চাই। মুশকিল হল, কার মধ্যে গবেষক হওয়ার দক্ষতা রয়েছে আর কার মধ্যে নেই, সেটা পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় না। অন্য দিকে, যে ছাত্রছাত্রীরা আবেদনপত্র পাঠিয়েছে, তাদের কারও সঙ্গেই আমাদের দেখা করার বা কথা বলার উপায় নেই। ফলে, তাদের সঙ্গে কথা বলে যে তাদের গবেষণার প্রতি ঝোঁক যাচাই করে নেব, সেটাও সম্ভব হয় না। ফলে, পরীক্ষার ফলাফল দেখে প্রথম দফার ছাঁটাই করে নেওয়ার পর আমরা স্টেটমেন্ট অব পারপাস এবং রেকমেন্ডেশনের মতো জিনিসগুলোর দিকে বেশি মনোযোগ দিই। সেগুলো থেকে বোঝার চেষ্টা করি, ছাত্রটি সত্যিই ভাল গবেষক হয়ে উঠতে পারবে কি না।

বিভিন্ন পরীক্ষার রেজাল্টকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়?

অনেকটাই। বাছাইয়ের প্রথম পর্যায়ে এর গুরুত্বের কথা একটু আগেই বললাম। তবে, ব্যতিক্রম হয়। কোনও ক্ষেত্রে হয়তো দেখা গেল, একটি ছাত্রের জি আর ই স্কোর তেমন ভাল নয়, বিভিন্ন পরীক্ষাতেও তেমন ভাল রেজাল্ট করেনি। কিন্তু, তার জন্য যে শিক্ষক চিঠি লিখে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন— এই ছেলেটি অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিমান, এর পরীক্ষার রেজাল্ট বা জি আর ই-র স্কোর ছেলেটির দক্ষতার যথার্থ পরিচায়ক নয়। এই চিঠিটি কতখানি গুরুত্ব পাবে, সংশ্লিষ্ট ছাত্রটির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃপক্ষ নিয়মের ব্যতিক্রম করবেন কি না, তা নির্ভর করে যে শিক্ষক এই চিঠিটি লিখছেন, তাঁর নিজের এবং প্রতিষ্ঠানের সুনামের ওপর।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের মধ্যে, অথবা একই দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরাসরি তুলনা করা কঠিন। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নির্বাচক কমিটিতে যাঁরা থাকেন, তাঁদের প্রায়শই এই সমস্যাটির মুখোমুখি হতে হয়। একটা উদাহরণ দিই। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে যে ছেলেটি ৬৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে, আর দিল্লির সেন্ট স্টিফেনস কলেজে যে ছেলেটি ৬৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে, তাদের দুজনের রেজাল্ট কিন্তু এক নয়। তার কারণ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেশি নম্বর ওঠে। যে শিক্ষকরা লেটার অব রেকমেন্ডেশন লেখেন, তাঁরা এই ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের একটা মস্ত উপকার করতে পারেন— তাঁদের চিঠিতে উল্লেখ করতে পারেন, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে কী রকম নম্বর ওঠে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যাঁরা লেটার অব রেকমেন্ডেশন লেখেন, তাঁরা ধরেই নেন যে সেই চিঠিটি যাঁরা পড়বেন, তাঁরা এই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সব জানেন। দেশের অন্য কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, এই প্রতিষ্ঠানের রেজাল্টকে কী ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে (মানে, 'ক' বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট ক্লাস মানে দেশের ২,০০০ ছাত্রের মধ্যে প্রথম ১০০ জনের মধ্যে থাকা)— কোনওটাই তাঁরা চিঠিতে লেখেন না। কাজেই, যাঁরা এই লেটার অব রেকমেন্ডেশন লেখেন, তাঁদের উদ্দেশে বলব, চিঠি লেখার সময় খেয়াল রাখুন— ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে একান্ত অপরিচিত কিছু মানুষ আপনার চিঠিটি পড়বেন। দেশের শিক্ষা-মানচিত্রে আপনার প্রতিষ্ঠানটি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের (যেমন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়) তুলনায় আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট ক্লাসের গুরুত্ব কেমন— স্পষ্ট ভাবে জানান।

এখানে আরও একটি কথা বলব। লেটার অব রেকমেন্ডেশনে শিক্ষক তোমার পরীক্ষার ফলাফল বা র‍্যাঙ্কের কথাটুকু সংক্ষেপে লিখে দিলেন— সেটাই যথেষ্ট নয়। সেটা অবশ্যই জরুরি, কিন্তু আরও কিছু কথা লেখার প্রয়োজন আছে। তুমি নিজে থেকে ভাবতে পারো কি না, কোনও প্রশ্ন করা হলে কী ভাবে তার জবাব দাও, কোন ধরনের প্রশ্নে তোমার আগ্রহ রয়েছে— সবই একটা ভাল লেটার অব রেকমেন্ডেশনে থাকা প্রয়োজন। পরীক্ষার রেজাল্টে তোমার যে গুণগুলো ধরা পড়া সম্ভব নয়, অথচ ভাল গবেষক হওয়ার জন্য যে গুণগুলো অতি জরুরি, সেগুলোর কথাও চিঠিতে থাকতে হবে। যে লেটার অব রেকমেন্ডেশনে গল্পের ছলে ছাত্রের এই গুণগুলোর কথা উল্লেখ করা থাকে, সেটাই সেরা চিঠি।

স্টেটমেন্ট অব পারপাস-এ ঠিক কী কী থাকলে সেটা 'ভাল' বলে বিবেচিত হবে?

এই প্রশ্নটার কোনও সহজ উত্তর নেই। যদি প্রশ্ন করা হয়, একটা ভাল কবিতায় কী কী থাকতে হবে, অথবা একটা ভাল প্রবন্ধে কী কী থাকা প্রয়োজন— তা হলে তার উত্তর দেওয়া যে রকম কঠিন, এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়াও তেমন। নির্বাচন কমিটির এক জন সদস্যের কথা ভাবো— তাঁর হাতে ঘণ্টাদুয়েক সময়, এর মধ্যে দশটা আবেদনের ফাইল দেখে ফেলতে হবে। তিনি যাদের ফাইল দেখছেন, তাদের কাউকেই কখনও দেখেননি; যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, হয়তো তার সম্বন্ধেও ধারণা নেই— এ দিকে গবেষক হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এমন ছাত্রছাত্রীকে বেছে নিতে হবে। এই যে শিক্ষকের কথা বললাম, এর সঙ্গে 'সরাসরি কথা বলা'-র একটাই সুযোগ তোমার আছে— স্টেটমেন্ট অব পারপাস-এর মাধ্যমে। তোমার সম্বন্ধে বাকি যতগুলো কথা এই ভদ্রলোকের কাছে পৌঁছেছে, সবই অন্য লোকের মতামত, তোমার সম্বন্ধে অন্যের ধারণা, বিচার। এই সরাসরি কথা বলার একমাত্র সুযোগকে কী ভাবে কাজে লাগাবে, তার কয়েকটা সহজ নিয়ম: অবান্তর, বহু বার বলা কথা বোলো না— যেমন, খুব ছোট থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল যে আমি বড় হয়ে অর্থনীতিবিদ হব; আমি পৃথিবী থেকে দারিদ্রের সমস্যাটি মুছে দিতে চাই; আমি কলেজস্তরে অর্থনীতিতে খুব ভাল নম্বর পেয়েছি, তাই এই বিষয়ে পিএইচ ডি করতে চাই; অমর্ত্য সেনের লেখা পড়ে আমি অর্থনীতিতে আগ্রহী হয়েছি! হয়তো কথাগুলো সবই সত্যি, কিন্তু আরও শ'খানেক আবেদনে ঠিক এই কথাগুলোই লেখা হবে। তোমার লেখা পড়ে যেন মনে হয়, তোমার নিজস্বতা আছে। ধরো, একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করলে, যেখানে কিছু একটা ঘটতে দেখে তুমি প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলে, তার পর বুঝতে পারলে, অর্থনীতির যুক্তি দিয়ে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা যায়। আরও একটা কথা মনে রেখো— এটাই কিন্তু তোমার একমাত্র সুযোগ যেখানে বুঝিয়ে দিতে পারো যে তুমি শুধুমাত্র পরীক্ষায় ভাল ফল করতেই পারো না, বাইরের দুনিয়া বিষয়েও তোমার উৎসাহ আছে, তুমি তা নিয়ে ভাবো। অনেক সময় স্টেটমেন্ট অব পারপাসে একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন তুলতে পারলেই যথেষ্ট হয়। তোমার কাছে এখনই কেউ উত্তর প্রত্যাশা করে না। মনে রেখো, তোমায় কোনও একটা কাজ করতে দেওয়া হলে তুমি দারুণ দক্ষতার সঙ্গে সেই কাজটা করে ফেলবে— তার জন্য তোমায় নেওয়া হচ্ছে না। তোমার কাছে প্রত্যাশা, তুমি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবে, এবং এক জন গবেষক হয়ে উঠবে। একটা কথা ভেবে দেখো— পিএইচ ডি-র আগে পর্যন্ত অন্যরা তোমায় প্রশ্ন করতেন, আর তুমি পরীক্ষায় সেই প্রশ্নের উত্তর লিখতে। পিএইচ ডি-তে তুমিই প্রশ্ন করবে, তুমিই উত্তর দেবে। স্টেটমেন্ট অব পারপাস লেখার সময় স্বাধীন ভাবে ভাবো, খোঁজখবর নিয়ে দেখো, পড়াশোনার দুনিয়ায় নতুন কী ঘটছে, নতুন কী পেপার লেখা হচ্ছে। এই কাজটা করার জন্য শুধু বন্ধুবান্ধব বা শিক্ষকদের ওপর নির্ভর করে থেকো না, ইন্টারনেট ব্যবহার করো। যেমন ধরো, গুগ্‌ল স্কলার সার্চ তোমায় অনেকখানি সাহায্য করতে পারে।

পরীক্ষার রেজাল্ট ছাড়া আর কী ধরনের যোগ্যতার কথা আবেদনে উল্লেখ করলে ভাল হয়?

শুধু সেই যোগ্যতাগুলোর কথাই উল্লেখ করবে, যেগুলো পিএইচ ডি-র অ্যাডমিশন প্রসেসের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, এবং

তোমার মেধার পরিচায়ক। খেলাধুলো অথবা গানবাজনার দুনিয়ায় কী করেছ, সেটা যদি উল্লেখ করতেই হয়, তবে সংক্ষেপে করা ভাল। কোনও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলে? নেহাত ফেলনা ঘটনা নয়। কিন্তু, তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি এটা জানানো যে তুমি কখনও কোনও অধ্যাপকের রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছ কি না? করে থাকলে, কী কাজ করেছ, কী ধরনের তথ্য নিয়ে কাজ করেছ, তাকে কী ভাবে বিশ্লেষণ করেছ ইত্যাদি। মনে রেখো, কোন কথাটা সিভি-তে লিখবে, আর কোনটা লিখবে না, তা ঠিক করার একটাই মাপকাঠি— পিএইচ ডি-র ক্ষেত্রে বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় আর ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করার দিক থেকে কোনও পার্থক্য আছে কি?

ভর্তির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব বিশ্ববিদ্যালয়ই একটা মূল কাঠামো মেনে চলে। আর, এখন সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য যা যা জানা প্রয়োজন, তার সবটাই ইন্টারনেটে সার্চ করলে পেয়ে যাবে। ব্রিটেনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলে। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন বা ওয়ারউইকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়ম অনেকটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো, তবে পুরোটা নয়। কিছু ফারাক আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বস্তুত কোনও মাস্টার্স ডিগ্রি হয় না। স্নাতক হওয়ার পরেই পিএইচ ডি করা যায়। কোর্সওয়ার্ক শেষ করার পরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাবে ঠিকই, কিন্তু সেটা মূলত নিয়ম বলেই পাবে। তোমার পিএইচ ডি হয়ে গেলে সেই মাস্টার্স ডিগ্রির আর আলাদা কোনও দাম থাকবে না। অবশ্য, কোনও ছাত্র যদি পিএইচ ডি শেষ না করে, তবে চাকরির বাজারে তার মাস্টার্স ডিগ্রির দৌলতে সে কিছু সুবিধা পাবে। ব্রিটেনের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই মাস্টার্স ডিগ্রি আছে। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ যে এক বছরের এম এসসি প্রোগ্রাম আছে। দু'বছরের এম এসসি-ও আছে। ভারতে এম এসসি ডিগ্রির দাম যেমন, ব্রিটেনেও তেমনই। অনেকেই এম এসসি করার পর আর পিএইচ ডি করে না। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ পিএইচ ডি-র কথা মাথায় রেখে একটি বিশেষ মাস্টার্স ডিগ্রির ব্যবস্থা আছে, যাকে বলে এম রেস (মাস্টার অব রিসার্চ)। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পিএইচ ডি-র যে কোর্সওয়ার্ক করানো হয়, এটি তার সঙ্গে তুলনীয়। এত রকমের কোর্স, সেগুলোতে ভর্তি হওয়ার আলাদা আলাদা নিয়ম— আমারই কেমন গুলিয়ে যায়। কাজেই, বিস্তারিত জানতে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট দেখো।

আবার, ব্রিটেনের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে জি আর ই-র স্কোর চাওয়া হয় না (লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ চাওয়া হয়)। এই সব পার্থক্যের কারণেই, যখন ব্রিটেনের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র পাঠাবে, তখন সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটটি খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া ভাল।

ভবিষ্যতে যারা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি করার জন্য আবেদন করবে, তাদের জন্য কোনও পরামর্শ?

অর্থনীতি নিয়েই বলি। যদি মনে হয়, অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা এবং গবেষণা করার বাইরে আর কোনও কাজের কথা ভাবতেও পারো না, একমাত্র তা হলেই আবেদন করার কথা ভেবো। গবেষণা করতে হলে শুধুমাত্র গবেষণাই করতে হবে— কাজটি তোমার অখণ্ড মনোযোগ দাবি করে। এই কথাটা শুনে যদি অবাক হয়ে যাও, অথবা সারা দিন শুধু গবেষণা করার কথা ভাবলেই খুব বোরিং লাগে, তা হলে একটাই পরামর্শ— আবেদন করো না। মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য অবশ্যই আবেদন করতে পারো। সেই ডিগ্রি থাকলে চাকরির বাজারে তোমার দাম বাড়বে। এখন প্রচুর ধরনের কাজের সুযোগ রয়েছে। তার অনেকগুলোই বেশ ইন্টারেস্টিং। গবেষণার কাজে শেষে দারুণ ফল পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু সেই শেষ পর্যন্ত পৌঁছনোর পথটা খুব মসৃণ নয়। কঠিন কাজ, সারা দিন লেগে থাকতে হবে, এবং হয়তো দেখবে, অনেক দিন কাজ করার পরেও আসলে একটুও এগোতে পারোনি। এখন আমি কী করছি, জানো? আমার একটা গবেষণাপত্রের জন্য একটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছি, বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে। মাঝে মাঝে হতাশ লাগে তো বটেই। কিন্তু, একই সঙ্গে আমি এই চ্যালেঞ্জটাকে উপভোগও করি। শেষ পর্যন্ত যখন অঙ্কটা মিলিয়ে ফেলতে পারব, তখন যে আনন্দটা হবে, সেটার একটাই তুলনা মনে পড়ছে— কঠিন ডিফেন্স চিরে গোল করতে পারলে স্ট্রাইকারের যে রকম আনন্দ হয়। এই পরিশ্রমের কথাটা অবশ্য সব ক্ষেত্রেই সত্যি। আমরা খেলার মাঠে দেখি, সেরা খেলোয়াড়টি প্রায় অসম্ভব সব কাজ করে ফেলছেন। কিন্তু, তার পিছনে যে দীর্ঘ প্র্যাকটিস থাকে, সেটার কথা ভুলে গেলে চলবে না।